অন্নদাত্রী

বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী

স্কুল থেকে ফেরার পথে চরণযুগল আর হাওয়াই জোড়া ধূলিধূসর, বাড়ির বাইরের পুকুরঘাটে নেমে পা ধুচ্ছি, খানিক তফাতে আমাদের এজমালি পাঞ্জেগানা মসজিদের অবস্থান, ওদিক থেকেই শুনতে পেলাম আমার পাশের বাড়ির বড় চাচার বড় গলা—রাখো রাখো তোমাদের ও 'সব মুছলা টুছলা আর যন্তোসব বড় বড় কথা! তুমি আর দেখেছো কী, সেদিনকার বাচ্চা, নাক টিপলে দুধ বেরোবে—

খুব গরম চলছে ক'দিন। গনগনে রোদ পৃথিবী পোড়াচ্ছে। বড় চাচার মন মেজাজও আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খুব ক্ষিপ্ত বুঝতে পারি। এমনিতেও খুব রাগী বলে পাড়া-পড়শি, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তার একটা সুনাম আছে। মসজিদের পূর্বদিকে ঘর বরাবর লম্বা বারান্দা টানা, তার এক অংশে বাঁশ মুলির তর্জা বেড়া বসিয়ে কোঠামতন করে দেওয়া, তাতে একখানা তক্তপোশ, চেয়ার-টেবিল ফেলে 'মুল্লা' ছেলেটি থাকে। আমাদেরই সম্পর্কিত এক আত্মীয় পুত্র সে, বড় জোড় বয়েস-টয়েস সতের-আঠার, কিলোমিটার কয়েক দূর গঞ্জের মত যে আধা-শহর খবর আমার অজানা, তবে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে যা জেনেছি, এই মাদ্রাসায় আরও মাস আষ্টেক পড়া বাকি রয়েছে তার।

আমাদের এটা পাড়া-গাঁ। এ'সব গ্রামে-গঞ্জে 'মুল্লা'কে সম্বোধনে শুধুমাত্র 'মুল্লা' না বলে ডাকা হয়—'মুল্লাবেটা'। মুল্লার পিঠে 'বেটা' শব্দটা জোড়া দিলেও অন্তত আমাদের মুসলমান অন্তঃপুরিকারা কেউই 'মুল্লা' কাউকে বেটা বা পুত্রের মত দেখেন না। আমার নম্বর তিন পুত্রধন এই 'মুল্লাবেটা'র সমবয়সী এবং সম্পর্কে গলাগলি বান্ধব হওয়া সত্ত্বেও 'মুল্লা' যখন চা পান অথবা ভাত খেতে ভেতর বাড়ি আসে, তখন আমার স্ত্রীও পর্দা পালন করেন। বেগানা পরপুরুষের সামনে বালেগা আওরতের বেপর্দা বাহির হওয়া, কথা বলা, হাস্য লাস্য বিলকুল হারাম, না-জায়েজ! অথচ আমার বাড়িতে রোজকার কাজকর্মের লোক, ফেরি, মাছওলা, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজের সহপাঠী-সহচর যারাই আসে সবার সামনে স্ত্রী আমার বের হন, কথা বলেন, দরকার মত চা-পান আপ্যায়নও। পরিহাসবশত স্ত্রীকে একদিন জিজ্ঞেস করেই বসেছিলাম, তোমরা কী ভেবে মোল্লা-মৌলবি-তালেবাদেরই শুধু এতো পর্দা করো? চোখে কি তোমাদের ওরাই শুধু একমাত্র পুরুষধন?

শুনেছি মুল্লা ছেলেটি এবার হাইস্কুল লিভিং দেবে। মাদ্রাসার পড়া আছে, তারপর ক্লাস, তারপর পাঞ্জেগানায় নামাজ পড়ানো, ফজিরের নামাজ পড়ে আট-ন'টা পর্যন্ত বাচ্চাদের নিয়ে বসা মসজিদের বারান্দায়, ইশকুলি পড়ার ফাঁক কোথায়, তবু সময়ের থেকে একটু একটু ফাঁক করে নিতে হয় তাকে, শুনেছি সে উভয় ধরনের পড়াশোনাতেই ভাল, এখন হয়তো মাদ্রাসা ফেরৎ পড়তে বসেছে, এই সময়ে বড় চাচার এই উত্তপ্ত আবির্ভাব—।

গৃহ প্রবেশান্তে স্ত্রীকে এক কাপ চা করে দিতে বলি, ঘর্মাক্ত প্যান্ট-শার্ট-গেঞ্জি-আন্ডারওয়্যার ছেড়ে-ছুঁড়ে শুধুমাত্র লুঙ্গি কোমরে সুইচ দেবার সময় দেখি কারেন্ট উধাও। গোষ্ঠীর মধ্যে জীবিত একমাত্র সবচেয়ে বয়স্ক মুরুব্বি বড় চাচার গলাবাজিতে বিরক্ত এমনিতে, বয়েস হলে যেন সবাই সবজান্তা, ছেলেটার পরীক্ষা, তার আসন জুড়ে বসে উদ্ভট বকবকুনি, চেঁচামেচি, চিৎকার, গা-পোড়ানো পাষণ্ড গরম, খুব একটা ইতর কথা উচ্চারণ করি। হাঁড়িতে সফেন ভাত উথলে উঠলে যেমন করে ঢাকনা সরিয়ে দেন আমার স্ত্রী।

হাত পাখা হাতে নিই, পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসি, স্ত্রীর দিকে তাকাই বিরূপ দৃষ্টিতে—কই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কী, রূপ-টুপ কি ফেটে বেরোচ্ছে আমার।

সে ঠোঁট একটু বাঁকায়, বাঁকানোর ধরনটা বড় চমৎকার—আহারে আমার রূপকুমার!

বললাম—আগেকার দিনে স্বামীরত্ন রোদে ঘেমে এলে সতী-সাবিত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাওয়া করতেন। আহা কী দিন গেছে। সে দিনে কেন জন্মালুম না! এখন শাহবানু আর তসলিমা তোমাদের মাথা খেল! চা'টা আন, পার যদি সঙ্গে এক গ্লাস লেবুর শরবতও অথবা তেঁতুলের, বিস্কুট-টিস্কুট যদি কিছু থাকে!

ফিরোজা বলল না কিছু, অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছিল, যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে আমি ডাক দিয়ে ফেরালাম—তিন কাপ, এক কাপ ঐ মুল্লাবেটা, এক কাপ বড়ে চাচা।

—কোন বড়ে চাচা?

—কোন আবার, ঐ বাড়ির বড়ে চাচা, গোষ্ঠীর মাথা! কোন কাজ নেই তো! বেচারার পরীক্ষা সামনে। বসে বসে মুছলা নিয়ে তর্কাতর্কি।

ও'সব পাখা-টাখা ঘুরানোর অভ্যেস নেই আমার। আমার চাচি পারতেন। তার পেটের ছেলে যেদিন মারা যায় সেদিনই আমার আসা। তিনদিন যখন আমার, মা অচেতন ঘুমে, আমি নাকি অবিরাম কাঁদছি আর হাত-পা ছুঁড়ছি তখন, চাচি চুপিসারে এসে তুলে নিয়ে গেলেন। মায়ের দুধ খাবার আমার বিশেষ প্রয়োজন পড়েনি। আর খাবার সুযোগও ফুরিয়ে যায়, শিগ্‌গির।

মা বাইরে থাকতেন বাবার সঙ্গে। আমার জন্মের আগে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন বাবা। মায়ের মৃত্যুর চল্লিশ দিনে চাচি শিরনি করলেন। অনেক গরীব-দুঃখীকে খাওয়ানো হল। মৌলবি-মৌলানারা এসে পড়াশুনো, দুয়া-দরুদ করলেন, কোরমা-পোলাও খাইয়ে বিদায় দেবার সময় জনে জনে দেওয়া হল পারিতোষিক। বাবা তাঁর নব অর্ধাঙ্গিনী সহ চল্লিশা শিরনির দাওয়াতে এসেছিলেন। ফিরে যখন যাচ্ছেন তখন চাচা বললেন—তুই তো আরেকটা বিয়ে করেছিস্। ছেলে তোকে আল্লা আরো দেবে। এই ছেলেটা আমাকে দে। বড় খারাপ তকদির এর, জন্মাতেই মা খাওয়া!

বাবা আপত্তি করেননি।

তা সেই চাচির আমসত্ত্বের বয়াম সরানোর তালে ছিলাম আমি, তিনি ঘুমিয়ে, চোখ বন্ধ, তথচ পাখাটা চক্কর খাচ্ছে দিব্যি ক্যাচ্‌ক্যাচ, ক্যাচ্‌ক্যাচ, শব্দ কখনো মৃদু কখনো দ্রুত লয়ে, কখনো থেমে যাচ্ছে, হাতটা কখনো পাখাশুদ্ধ এলিয়ে তাঁর বুকের উপর পড়ে যাচ্ছে, আমি ভাবছি এই বুঝি ঘুমটা গাঢ় হয়ে এল, আলমিরার ডালা খুলতে যাব, ওটা খুলতে গেলেই ক্যাক্ করে যা বিশ্রী একটা শব্দ করে না, তাকিয়ে দেখি পাখা আবার যথারীতি ঘুরছে, তাঁর

হাতখানা আর এলানো নেই।

চাচির দুধ খাবার কথার সঙ্গে মনে পড়ে যায় নাক টিপে দুধ বের করার কথা। নাক টিপলে কি দুধ বের করা যায়, হয়? কথাটা অনেকেই বলে বটে, মৃত্যুর পর মানুষেরা কবরগাহে মৃতদেহ দাফন-কাফন করে চল্লিশ কদম চলে আসার পর নাকি চারপাশের মাটি এসে মৃতকে এমন করে চেপে ধরে যে জন্ম নেবার পর খাওয়া সমস্তটুকু দুধ নাক-মুখ দিয়ে বের করে ছাড়ে। পাখাটা ঘোরাচ্ছিলাম ডানহাতে, সেটা বামহাতে নিয়ে ডানহাতে নিজেই নিজের নাকটা টিপে ধরি। বেরিয়ে আসে আঠালো কিছু তরল, থিকথিকে, ধুলোটে। চোখের সামনে তাই তুলে ধরে দেখছিলাম, ভাবছিলাম কত কী ধুলোবালি নাসিকা দিয়ে এই দেহ যন্ত্রে প্রবেশ করে, কোন রাজা বাদশার নাকি নাক দিয়ে মশা ঢুকে গিয়েছিল, তার মৃত্যু ঘটে, মৃত্যু চিন্তা কেন যে সম্প্রতি আমায় বারবার অবশ করছে, কালরাতে স্বপ্ন দেখছিলাম আমি মরে গেছি, চাচি এসে জিজ্ঞেস করছেন—কিরে কখন এলি? এ'যেন নিজ নিকেতন ফেরা অথবা কোন স্বজন গৃহ, ঘাম দিয়ে ঘুম ছাড়ে, পাশ ফিরে দেখি ফিরোজা অঢেল ঘুমে, ওর নাক দিয়ে এক ধরনের বিদ্‌ঘুটে শব্দ বেরোচ্ছে। ওটা বদ্ অভ্যেস ওর!

ফিরোজা এল ট্রে হাতে করে, তা'তে চা, শরবত, বিস্কিট, নাসপাতির টুকরো। টেবিলে সে সব কিছু নামিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় খেঁকিয়ে ওঠে—এই কী হচ্ছে ও সব, হচ্ছেটা কী, ছিঃ ঘেন্না করে না তোমার, ছিঃ ছিঃ তুমি মানুষটা মানুষ না অন্য কিছু। যাও বাথরুমে গিয়ে ভাল করে সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসো। খবরদার বলছি ওই নোংরা হাতে আমার গ্লাস-কাপ কিছু ছোঁবে না!

বাথরুম থেকে এসে প্রথমে শরবতটুকু খাই, তারপর নাসপাতির টুকরোগুলো। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে ফিরোজাকে আমি খবরটা বলি—এই, কাল রাতে চাচিকে স্বপ্নে দেখলাম।

চাচির আর ছেলেপুলে হয়নি। চাচা মারা গেলে তাঁর মেয়েরা বাড়ি জমি বিক্রি করে মাকে তাদের কাছে নিয়ে যায়। আমি তাঁকে আমার কাছে থেকে যেতে বলেছিলাম। তিনি থাকেননি। তা ছাড়া বাড়ি-জমি বিকি-কিনি, ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তাঁর মেয়েদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সে কারণে চাচিকে কখনো আমি দেখতে যাইনি। শুনতাম তিনি একে তাকে প্রায়ই আমাদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন।

ফিরোজার হাতে উলের কাঁটা ঘুরছে। আমার কোন কথায় তার কান আছে কি না বুঝতে পারি না। সে আমাকে না জানিয়েই মাঝে মধ্যে চাচিকে দেখতে যেতো, জানি। আমি না জানার ভান করে থেকেছি। এই ক'দিন হয় মেয়ের বাড়িতে সাধ পাঠিয়েছে ফিরোজা। সম্ভাব্য নব জাতক-জাতিকার জন্য সোয়েটার বোনায় ব্যস্ত। এরই মধ্যে কারেন্ট এসে যায়। আমি তাকে বলি—ফ্যানটা দাও।

সে প্রথমে না-শোনার ভান করে। আবার বললে বলে—কাজ করছি দেখতে পাচ্ছ না?

—সামান্য সুইচটা দিতে গেলে তোমার কাজটা তো চলে যাবে না।

সে নড়ে না, বলে—তুমিও তো দিতে পার, অন্যকে বলা কেন?

—তোমাকে বলা মানে অন্যকে বলা হলো?

—হলো।

সুইচটা আমিই দিই। দিয়ে বারান্দায় গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াই। আকাশটা এমন যে তাকানো যাচ্ছে না। ওর দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা তুমি কেয়ামতে বিশ্বাস করো?

—কেন, যেহেতু আমি মুসলমান, করি। হঠাৎ এ কথা কেন?

—কেয়ামত, হানার, শেষ বিচারের দিন-সবাই, সব মানুষ একসঙ্গে এক মাঠে জড়ো হবে তাই না?

—হবে। তো—?

একটা নাম না জানা পাখি দূরে কোথাও ডেকে যাচ্ছে। চাচির কথা মনে পড়ছিল আমার। স্বপ্নে তাঁর জিজ্ঞেস করা 'কখন এলি' কথাগুলো বারবার আমার কানে বাজছিল। আমি তাঁর চেহারা, তাঁর প্রিয়মুখ স্মরণে আনতে চেষ্টা করে যাচ্চিলাম, তাঁর কণ্ঠস্বর—উফ্! কতো কতো বৎসর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে আমার! কী এক ধরনের কষ্ট, এক ধরনের অপরাধবোধ পীড়িত করছিল আমাকে। আমি নিজেকে ভিন্নতর কোন চিন্তা-চেতনায় সরিয়ে নিতে চাইছিলাম, বলি—আমার ছোটমামাকে তো চেনো, দেখোনি অবশ্য, শুনেছো আমার কাছে, তাঁর ছোট ছেলে আহমদ, ছোটমামা যখন ছোটমামীকে তালাক দিল, আহমদ কত বৎসরের, বড় জোর পাঁচ/ছ', তখন অহেতুক, তোমাদের মেয়েলোকদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ওরা ওকে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁরে আহমদ তোর মাকে মনে পড়ে, তাঁর জন্যে তোর মন কেমন করে না? তখন আহম্মদ কী জবাব দিত জানো?

ভেবেছিলাম ফিরোজা জিজ্ঞেস করবে আহমদ জবাবে কী বলতো, তার দিক থেকে কোন প্রকার সাড়া নেই, আম তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো, ফিরে তাকালাম, তার চোখ উলের কাঁটায়, আঙুল চলছে খুব দ্রুত, বললাম—সে এখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরাজি বিভাগে প্রধান, মামারা সবাই পার্টিশানের পর তখনকার পাকিস্তান এখনকার বাংলাদেশ হিজরত করেছিলেন, সে বলত—কিন্তু বাবা যে যেতে দেয় না। বরঞ্চ অপেক্ষা করে থাকবে সে, কেয়ামতের ময়দানে মায়ের সঙ্গে দেখা হবে তার, তখন তো বাবা আর চড়-চাপড় চালাতে পারবে না।

ফিরোজা এই সময় উলের কাঁটা থামায়, বলে—অথচ এই ছেলেটিই বড় হলে স্ত্রীকে পেটাবে। তালাক দেবে।

—বড় হবার আর কী বাকি? বললাম না ইংরাজির হেড। সত্যিই, শুনেছি সে তার প্রথমাকে তালাক দিয়ে প্রাইভেট পড়াতো এক ছাত্রী—

—বললাম তো!

শান দেয়া নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর তার। যেন চক্চকে ধারালো ইস্পাত। আমি তা উপেক্ষা করে বললা—আসলে কী জানো?

—কী?

—ছেলেরা যখন বউ পোড়ায়, তখন শাশুড়ি-ননদেরা উৎসব আনন্দ করে।

—জানি এই কথাই বলবে!

সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি এবার এসে বসলাম।

—চাচি নিশ্চয়ই বাড়ি নেই?

—কোন চাচি?

—বড় চাচার চাচি। উত্তর বাড়ির বড় চাচার চাচি।

—ওর বোনের মেয়ের মেয়ের বাড়ি।

—থাকেন কদিন বাড়ি? বিরক্ত হই।

যুবতী কমবয়সী মেয়ে, বুড়ো-কাষ্ঠার ঘরে বসে করবেটা কী, পাকা চুল বাছবে? ফিরোজারা কণ্ঠে ক্রোধ ঝরে পড়ে।

বড় চাচা হানিফ মিঞার বয়স, তিনি বলেন আটানব্বুই, আমরা অনুমান করি পঁচাশি-ছিয়াশির একটু উপর-টুপর। আমি আরেকটা সিগারেটে আগুন দিলাম।

এই চাচার প্রথমা স্ত্রী ফিরোজার আপন ফুপু। তিনি মারা গেছেন। যখন জীবিত তখন মাঝে মধ্যে ফিরোজা এসে থাকত তাঁর কাছে। সে সময় তাকে দেখা। কিশোরী ফিরোজা, ছটফটে, কখনো ওর ফুপুর সঙ্গে আমাদের বাড়িও বেড়াতে আসত। তখন আমি কলেজে। অবশ্য আমাদের মধ্যে কোন তথাকথিত প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার ঘটার সুযোগ এবং সম্ভাবনা ছিল না। ওর ফুপু মারা যাবার অনেক বৎসর পর সম্বন্ধ করে আমাদের বিয়ে।

পাখিটা আর ডাকছে না অনেকক্ষণ। হয়তো সে স্থান ত্যাগ করে কোথাও উধাও। হয়তো তার গলা ধরে গেছে। To the cuckoo কবিতাটির substance আমি আমার নিজের ইংরাজিতে লিখে ফেলায় হেড স্যার আমাকে তাঁর নিজের কলমটাই দিয়ে দেন। আমার ছোট ভাই সেটা হারিয়ে ফেলে। মানুষের সুখ নামক বস্তুটাও এমনি করে কেন যেন হঠাৎ করে কোথাও না কোথাও হারিয়ে যায়।

আমি লক্ষ্য করি ফিরোজার কপালে উড়ে আসা কেশগুচ্ছে ধবধবে সাদা রঙের প্রলেপ। পাতলা হয়ে যাওয়া কেশের ফোঁকর দিয়ে তালুদেশ দৃশ্যমান। অথচ একসময় তার ছিল মাথাভরা চুল। আমাদের বিয়ের পর চাচি প্রায়ই দু'একজন মেয়েকে কাজ দিতেন ফিরোজার চুল আঁচড়ে, তেল মাখিয়ে ঠিকঠাক করে খোপা অথবা বিনুনি বেঁধে দিতে। আমি চাচিকে চাচিই ডাকতাম, সে ডাকতো মা!

দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। ফিরোজা বলে—তোমার দুই মা—এক মা গর্ভধারিণী, অন্যজন বুকে তুলে নিয়েছিলেন। দু'জনই মা।

আমার কখনো কখনো বিচিত্র সব ইচ্ছে হয়, বিচিত্র ভাবনা। একদিন কথায় কথায় কী একটা ব্যাপারে আমাকে একজন বলেছিল—আপনার বয়েস হয়েছে, বুড়ো মানুষ, সব কিছু আপনার খেয়াল না করাই ভালো, আগেকার সঙ্গে এখনকার দিনকে মেলাবেন না, না-পছন্দ্ হবে, সুখ পাবেন না। আমার সত্যিই সুখ লাভ হয় না। 'বুড়ো' বললে আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয়। অথচ বুড়ো তো, হতে আর বাকী কী, আমি ফিরোজার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি।

আমাদের গ্রামের এক গরীব ক্ষেতমজুর মুতলিব সেক্। সে তার স্ত্রীর কথার খুব বাধ্য। তার স্ত্রীকে সবাই বলে 'মুতলিবের আয়না'। বেচারি বেজায় চটে গালাগাল করে। আমি আমার নিজস্ব দর্পণে নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে চমকে যাই। 'হরি দিন তো গেল...'

আমি ফিরোজাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করি—তোমার দিন কেমন হল?

—মানে? ফিরোজা চমকে যায়। বোঝা যায় সেও ভাবছিল এমন কিছু যে ভাবনা তাকে তার এই এখনকার অবস্থান এবং আমার উপস্থিতি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে, আমার গলা তাই তাকে চমকে দেয়, যেন তার সে ভাবনার জগতে আমার উপস্থিতি খুবই সামঞ্জস্যহীন, বেমামান, জিজ্ঞেস করে—দিন কেমন হল মানে?

আমার যে 'হরি দিন তো গেল' গানটা মনে পড়াতে কথাটা বলা সে কথা তো সে জানে না, জিজ্ঞেস করি—তোমার বয়েস?

—ও! সে বিরক্ত যথেষ্ট, তার হাতের কাঁটা ফের সচল হয়—তুমি মাঝে মধ্যে এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন কেন যে করো? আমার ভালো লাগে না।

—তোমার ফুপুর কথা মনে পড়ে? কী যে ভাল ছিলেন ভদ্রমহিলা! অনেকদিন দেখা, গরম-গরম ভাত তরকারি, চাচা জোহরের নামাজ পড়ে খেতে বসেছেন, প্লেটে ভাত লাগিয়ে মাছের কয়েকটা বড় টুকরো চামচে তুলে চাচি বলছেন—এই মাছগুলোও খান, আপনি তো ইলিশ খেতে বড় পছন্দ করেন...। চোখ জুড়িয়ে যেত, বড় সুখী সংসার, বড় আদর্শ। ফিরোজাকে খোঁচা দিই—তুমি তো কখনো এ'সব পছন্দ করো না—!

ফিরোজার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—তুমি দেখবে! যার যা দেখার বাসনা...

—মানে?

—মানে এ'দৃশ্য তোমার কখনো চোখে পড়ার নয়, কল্পনা করতে পারো, ফুপু মাছ কুটছেন, তোমার চাচা এসে পান চাইলেন, ফুপু বললেন তরকারি বসাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, জোহরের নামাজ মসজিদে পড়ে এসেই সঙ্গে সঙ্গে ভাত না পেলে কুরুক্ষেত্র, থালিতে পান-চুণ-সুপারি সবই জুৎ করে রাখা, একটু কষ্ট করে নিজের হাতে খিলি তৈরি করে...

টেবিল থেকে দৈনিকখানা নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখি।

ফিরোজা বলে—তোমরা পুরুষেরা স্ত্রীকে দাসী থেকে বেশি কী ভাবো? ফুপু মাছ কুটছেন। হাত ধোবেন। তারপর পান-সুপুরি সব সাজিয়ে দেবতার সম্মুখে নৈবেদ্য তুলে ধরবেন। দেবতার হাত-পা নেই। পানটা সেজে খেতে পারেন না। অথচ স্ত্রী পেটাবার বেলা সেই দেবতারই হাত-পা সব ঠিকঠাক চলে। প্রথমে লাথি, ঘুষি, তারপর ভারী পানের থালা ছুঁড়ে মারা হয় তাঁর কপালে। আমি ছিলাম সামনে। মরার পর ফুপুকে যখন শেষ গোসল করানো হচ্ছে তখনো। কপালে গভীর ক্ষত। শুকোলেও দাগ আর গর্তটা থেকে গেছে। আমার চোখে চোখে তাকায় সে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—বড় সুখের সংসার। বড় আদর্শ! তাই না? কথাগুলো বলে সে তার কাজে মন দেয়!

টেবিলে রাখা খানকয়েক ডাকে আসা কার্ড, এনভেলাপ ইত্যাদি। সবগুলোই পড়ে রাখা, আমি সেগুলো নাড়াচারা করি, এক দু'খানা আবার পড়ি। একজন লেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন, অণুগল্প, আমার ইচ্ছে হয় সম্পাদককে লিখি, কী মশাই, ক'দিন পর আবার পরমাণু গল্প চেয়ে পাঠাবেন না তো? টেবিলে

কাগজ-কলম রাখা থাকে, একখানা সাদা কাগজ টেনে নিই, মাননীয় মহাশয় লেখা হয়, তারপর দু'ছত্র, তারপর লেখা আর এগোয় না, ছিঁড়তে থাকি কাগজখানা।

ফিরোজা আবার উলের কাঁটা থামায়। আমার কাগজ ছেঁড়া দেখে। তারপর আমি ভেবেছিলাম আমার কাগজ ছেঁড়া দেখে সে কিছু বলবে, কারণ কিছু টুকরো ফ্যানের বাতাসে ওড়ে ওড়ে মেঝেয় পড়ছিল, কিন্তু না, তেমনই রাগী গলা তার, তিক্ততায় ভরা, সে প্রশ্ন রাখে—বলবে আমাকে তোমাদের পুরুষ আর নারীতে কী পার্থক্য? এই বুক, এই....

অত্যন্ত অশ্লীল কিছু শব্দ উচ্চারণ করে সে। আমি তার কষ্ট বুঝতে পারি, কিন্তু তার এই নিলর্জ্জতা, আমি অপ্রস্তুতবোধ করি, সে তার প্রশ্নটা এইভাবে শেষ করে—এই, এই তো পার্থক্য, দৈহিক, শারীরিক, এতে কী, এতে কী? কী এসে যাচ্ছে? কেন তোমরা এত নীচ, এত জঘন্য আচরণ করবে আমাদের প্রতি?

আমার বসে থাকা হয় না। লুঙ্গি, গামছা, সাবান জোগাড় করে বাইরের পুকুরে গোসল করতে যাই। ফিরোজা রান্নাঘরে কাজ করতে গেছে। আজ একটা মুরগি জবাই হয়েছে, ডিমা মুরগি, ডিমগুলো নাকি ভেতরে ভেঙে গেছে, দিন কতক থেকে ঝিমোচ্ছিল, খাওয়া দাওয়া বন্ধ, বাধ্য হয়ে জবাই করতে হয়েছে, ফিরোজা মুরগাটাকে শুধু গাল পাড়ছিল, ওটাই নাকি এর জন্য দায়ী! ভাবছিলাম আজ খেতে বসে একটু বেশিই খাওয়া যাবে। একটু পোলাও করতে বলেছি ফিরোজাকে।

জোহরের নামাজ পড়ায় 'মুল্লা' ছোকরাই। বাকি নামাজটা আমি। পড়া শেষ করার পর সে আমার কাছে এগিয়ে আসে। বুঝলাম কিছু বলতে চায়। জিজ্ঞেস করলাম-কিছু বলবে?

সংকোচে সে কুঁকড়ে যাবে প্রায়—আজ উনার ঘরে খাবার কথা ছিল, মানে আপনার বড় চাচার।

—তো?

—হানিফ দাদার ঘরের দাদি তো বাড়ি নেই।

—জানি।

—তিনি সকাল বেলা রাতের ঠাণ্ডা ভাত ছিল, তাই খেয়েছেন। দুপুরে রাঁধেননি। আমি সকালেও না খেয়ে মাদ্রাসায় গেছি।

বড় চাচাকে দেখলাম নামাজ শেষ করে কবর জিয়ারত করছেন। কবরখানা মসজিদের সামনেই। তাঁর দোয়া-দরুদ পড়া শেষ হলে আমি ডাকলাম—চাচা!

—কে? ও রহমত। কী ব্যাপার?

গলার স্বর তাঁর বেশ রুক্ষ। লোকে বলে আম পাকলে মিঠা, মানুষ পাকলে তিতা। খুব দরকার না পড়লে আমি তার সঙ্গে কথা বলি না। বললাম—ব্যাপার কিছু না, আজ দুপুরে আমার ঘরে আপনার দাওয়াত।

—হঠাৎ?

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়—অর্থাৎ আজ কিনা ফিরোজার মরহুমা ফুপুর ওকাতের দিন।

অদ্ভুত কী রকম করে যেন তাকালেন তিনি, বললেন না কিছু, কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন, তারপর সম্মতি জানালেন—ঠিক আছে, যাব, একবার বাড়ি থেকে আসি।

মুল্লা ছেলের খাবার মসজিদে পাঠিয়ে দিয়ে আমার ছেলে তিনটে, আমি আর চাচা একসঙ্গে খাবার টেবিলে বসলাম। ফিরোজার মুখ কালো। সে পরিবেশন করছিল। আমি খেতে খেতে বড়চাচাকে বললাম—আমার মনে পড়ছে মরহুমা চাচি আপনাকে কী আদরে পাখার বাতাস করতেন, কী আদরে মাছের সব বড় টুকরো আপনার পাতে তুলে দিতেন, নিজের জন্যে কিছুই রাখতেন না!

তাঁর চোখের ভুরু খুব ঘন আর লম্বা। বয়সের কারণে অক্ষিগোলক বেশ ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, চামড়াও ঝুলে পড়ে সেগুলো অন্যের চোখে প্রায় অদৃশ্য করে রেখেছে। তিনি চোখ তুলে প্রথমে আমাকে দেখলেন। তারপর ফিরোজাকে। আমার ছেলেগুলো একটু গা টেপাটেপি, হাসাহাসি করছিল। আমি চোখ রেখে তাঁদের সতর্ক করে দিলাম। তিনি তাদেরও দেখলেন। তারপর ভাতের থালায় আবার চোখ রেখে বললেন—সবদিন আর কি সমান যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই—চাচি তো প্রায়ই বাড়ি থাকেন না। আপনি এই বয়েসেও রান্না করে খেতে পারেন বেশ! আমার হাতে তো এক কাপ চা করাও হয় না।

একটু হাসতে চেষ্টা করি।

তিনি কোন উত্তর করেন না।

ফিরোজা এখন আর বড় চাচাকে ফুপা বলে ডাকে না। আমার সম্পর্কে সম্পর্ক রাখে। জিজ্ঞেস করলো আচমকা—পান-সুপারি এখনো খান বড় চাচা? নিজের হাতে খিলি করে? নাকি এখনকার চাচি...?

খোঁচাটা ধরতে পারলেন বড় চাচা, ভাত মাখছিলেন, আঙুলগুলো কাঁপতে আরম্ভ করে, বললেন, কণ্ঠে নিরুপায়তার হাহাকার—সকালে আমার ভুখ মরেনি বৌমা, রাতের কিছু ভাত ছিল, আলস্য করে রাঁধলাম না, খেতে গিয়ে দেখি পিঁপড়ে উঠেছে, ধুয়ে খেলাম, তাও সব পিঁপড়ে গেল না, চোখেও কম দেখি।

আমি ফিরোজার দিকে তাকালাম। জীবনে এই প্রথম ইচ্ছে হলো তাকে মার দিই। দেখি সে হাসছে। আমাকে তাকাতে দেখে সে আমার কাছে এগিয়ে আসে—তোমাকে আর একটু পোলাও দিই, অনেকদিন পর পোলাও হয়েছে ঘরে, তুমি খুব শখ করো তাই...